বিহাইন্ড

ফেমিনিজম

নারীবাদের বাস্তবতা

বিহাইন্ড

ফেমিনিজম

নারীবাদের বাস্তবতা

সংকলন ও অনুবাদ
মারিয়াম তানহা

সম্পাদনা
ইরফান সাদিক

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

বিহাইন্ড ফেমিনিজম : নারীবাদের বাস্তবতা
সংকলন ও অনুবাদ : মারিয়াম তানহা
সম্পাদনা : ইরফান সাদিক
প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০২২

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ মুন্না
প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
অফিস : ৭/বি পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮ ৮৬ ৪৪ ২৮
০১৭৮৯ ৮৫ ৪৬ ০২
বাংলাবাজার পরিবেশক : তারুণ্য প্রকাশন
দোকান নং-১৩, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৯৭৯ ৫৪ ৬৭ ২২-২১
মুদ্রণ
মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com
বানান সমন্বয় ও পৃষ্ঠাসজ্জা
মুহিব্বুল্লাহ মামুন
মুদ্রিত মূল্য
২৭৩ ৳ মাত্র

উৎসর্জন

নারীদের ‘শুভাকাঙ্ক্ষী’ ন্যাটোর নারীমুক্তির অন্যতম উদাহরণ **‘আবির আল-জানাবি’**কে।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা : ০৯
সম্পাদকের কথা : ১১
অনুবাদকের কথা : ১৫
স্বাধীনতা নাকি নৈতিক অধঃপতন : পাশ্চাত্যের দ্বিচারিতা : ১৯
The Africom Files : মার্কিন সেনাবাহিনীর নারী চিকিৎসা : ২৩
লিবারেলিজম কেন চায় না আপনি নিকাব পরিধান করুন? : ২৫
নারী নেতৃত্ব : ৩৩
পুরুষতন্ত্র : নারীদের চাহিদা : ৪০
নারীবাদ কি সেক্সিস্ট? : ৪৪
পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে তিনটি মিথ : ৫৩
সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ এবং ইসলামবিদ্বেষের ভয়াল রূপ : ৫৮
#MeToo আন্দোলন : যৌক্তিকতা ও সমাধান : ৭০
দৃষ্টি! : ৯০
পশ্চিমের পুতুল মালালার বিষাক্ত নারীবাদ : ৯৩
আফগান নারীর জন্য শ্বেতাঙ্গদের কান্না : ৯৬
মুসলিম নারীবাদ : উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন : ১০৫
মুসলিম নারীবাদ : একটি পর্যালোচনা : ১১১
পশ্চিমা নারীবাদের মুখোমুখি অটোম্যান নারী : ১২৮
লিঙ্গ ভারসাম্য : আল্লাহর পরিকল্পনার প্রতি আত্মসমর্পণ : ১৩৯
মাতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : মুসলিম নারীবাদীদের অবস্থান : ১৫২
বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ : ১৬২
আমাদের নারীরা : উম্মাহর প্রাণ : ১৬৫
তারা চার : ১৬৮

প্রকাশকের কথা

বিশ্বজুড়ে নারীবাদী আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠে যদিও উনিশ শতকের দিকে; তবে এর উৎপত্তি মূলত আরও কয়েকশত বছর আগের ইউরোপের সামাজিক প্রেক্ষাপটে। যেখানে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের ন্যূনতম বালাই ছিল না। নারীর সাথে আচরণ করা হতো কৃতদাসীর মতো, বাজারে বিক্রি হতো নারী। কিন্তু সেই সময়ের মুসলিমবিশ্বের নারীদের অবস্থা ছিল ইউরোপীয় নারীদের জন্য ঈর্ষার কারণ। ১৮ শতকের ইউরোপীয় পর্যটক, নাট্যকার ও লেখিকা লেডি এলিজাবেথ কর্তৃক তৎকালীন তুর্কি নারীদের সম্পর্কে একটি বিবরণ থেকে এমনটাই অনুমেয় হয়। মূলত ইসলাম তার জন্মলগ্ন থেকেই নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে যারপরনাই গুরুত্ব দিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে এর জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপের নারীবাদী আন্দোলন মুসলিম ভূখণ্ডে কেন ছায়া বিস্তার করল? কোন প্রেক্ষাপটে? মূলত মুসলিম ভূখণ্ডে ইউরোপের শত বছরের বেশি ঔপনিবেশিক শাসন এই ভূখণ্ডগুলোকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ফলে তৎকালীন ইউরোপ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে যেসব মতবাদ তৈরি করেছিল, উপনিবেশিত মুসলিম জনগোষ্ঠীও সেইসব মতবাদের মধ্যেই নিজের মুক্তি খুঁজতে শুরু করেছে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে প্রগতিশীলতা। এই চিন্তাই মূলত উত্তর ঔপনিবেশিক মুসলিমদের সামগ্রিক উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে, এখন অবধি।

ফেমিনিজম। নারী অধিকারের চটকদার বুলিসর্বস্ব এই তথাকথিত মুভমেন্টের দাবি-দাওয়াগুলো শুনতে মধুর হলেও এই নামের আড়ালেই রয়েছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। এইসব অন্ধকারের পর্দা উন্মোচন করেছে এই বই। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে বিশ্বজুড়ে নারীর নৈতিক অধঃপতন, নারীমুক্তির দেশে নারী নির্যাতনের নোংরা চেহারা, হিজাব নিয়ে পশ্চিমের বর্ণবাদী রাজনীতি, লিবারেলিজম কেন হিজাব-নিকাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পুরুষতন্ত্রের মিথ্যা জুজুর ভয় দেখিয়ে ফেমিনিজমের ভিকটিম কার্ড খেল, পশ্চিমা সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ ও ইসলামবিদ্বেষের ভয়াবহ রূপ, উত্তর-ঔপনিবেশিক মুসলিম নারীবাদ,

নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব বা ইসলামি নারীবাদের নামে ইসলামের শাশ্বত চিন্তার সিলসিলায় নগ্ন হস্তক্ষেপ, লিঙ্গ ভারসাম্য বা লৈঙ্গিক সমতার নামে সৃষ্টিকর্তার চিরাচরিত নিয়মে ব্যাঘাত ঘটানো-সহ এ প্রসঙ্গের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে এই বইয়ে। এসব আলোচনা মূলত বিশ্ববিখ্যাত স্কলারদের বইপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে বেছে বেছে সংকলন করেছেন লেখিকা মারিয়াম তানহা। এই কাজটির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বলা যায় এটিকে যে, নারী-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এখানে একজন নারীই কলম ধরেছেন। আল্লাহ এই বোনকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাকে দাওয়াতের ময়দানে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, এই দোয়া করি। পুরো কাজটিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সম্পাদনা করে দিয়েছেন ইরফান সাদিক, তার প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে পাঠকদের বলতে চাই, বইটি যদি ভালো লাগে, তাহলে অফলাইনে প্রিয়জনদের মাঝে এবং অনলাইনে বন্ধুদের মাঝে আপনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ও নানা সূত্রে যারা এর সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা।

প্রকাশনার পক্ষে
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা

সম্পাদকের কথা

২০০৯ সালের মে মাসে "The Paradox of Declining Female Happiness" শিরোনামে প্রকাশিত হয় এক সাড়া জাগানো রিসার্চ। প্রবন্ধটি লিখেছেন দুজন অর্থনীতিবিদ—বেটসি স্টিভসন ও জাস্টিন উলফারস। দুজনেরই সন্তান ও বাড়ি আছে। ১৯৭০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আমেরিকার পরিবারগুলোর ওপরে একটা জরিপ চালান তারা। পুরো রিসার্চের মূল ফোকাস ছিল মূলত নারীদের কাজ ও মানসিক অবস্থা। তাতে বের হয়ে আসে অবাক করা এক ফলাফল।

স্টিভসন ও উলফারস আবিষ্কার করেন, ১৯৭০ এর দশকে মার্কিন নারীরা সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন নিয়ে পুরুষদের চেয়ে বেশি সুখী ছিল। তারপর থেকেই নারীদের সুখের মাত্রা কমতে থাকে। কিন্তু জীবন নিয়ে পুরুষদের সুখের মাত্রা অবাক-করা-ভাবে মোটামুটি একই থাকে। ১৯৯০ এর দশকে এসে দেখা গেল, নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি হতাশ। দশকের পরিবর্তনে নারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তন এলেও পুরুষরা ঠিক আগের মতোই আছে। স্টিভসন ও উলফারস এই রিপোর্টকে 'প্যারাডক্স' বলার কারণ হলো—বর্তমানে চলছে নারী ক্ষমতায়নের যুগ। বর্তমানে নারীরা পৃথিবীর ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি শিক্ষিত, বেশি ক্ষমতাবান, বেশি বহির্মুখী। যে নারীরা কম শিক্ষিত, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্তৃত্ব মেনে নেয়, পারিবারিক দিক সামলায়—তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই দেখা হয় জুলুমের শিকার হিসেবে। তাহলে নারীমুক্তির এ যুগে এসে নারীরা কেন অসুখী? কেন ৭০-এর দশকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তারা বেশি সুখে ছিল?

প্রশ্নটি জটিল। তবে উত্তরটি সহজ।

ফিতরাহ। আল্লাহ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় সৃষ্টি করেছেন। একেকজনকে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও সম্মান দিয়ে। আল্লাহ মানুষকে দুই লিঙ্গে সৃষ্টি করারও যেমন কারণ আছে, জেন্ডার রোল ঠিক করে দেওয়ারও কারণ আছে। যার কারণে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর ইতিহাসের ৯০%-এর বেশি সভ্যতা নারী-পুরুষের আলাদা জেন্ডার রোল মেনেই পরিচালিত হয়েছে। ৯০%-এর বেশি সমাজ

ছিল পুরুষতান্ত্রিক। স্বাভাবিকভাবেই একগাদা ডিগ্রি নিয়ে শেষজীবনে স্বামী-সন্তান ছাড়া একা একা মৃত্যুবরণ করা নারীর চেয়ে, ডিগ্রিহীন অবস্থায় ঘরভরতি সন্তান ও নাতিদের নিয়ে মৃত্যুবরণ করা নারী বেশি সুখী।

অথচ নারীবাদ এসে ঘুরিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর রোখকে। নারীকে বঞ্চিত করেছে শালীনতা, স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে, পুরুষের হাতে পরিয়ে দিয়েছে চুড়ি। নারীকে স্বামী-পিতার নিরাপত্তা থেকে বের করে বানিয়েছে ভোগের বস্তু। অর্থ দিয়ে তার সম্মান সংজ্ঞায়িত করে তাকে লাগিয়ে দিয়েছে এক অসীম র‍্যাট রেইসে, কবরের মাটি ছাড়া তা থেকে মুক্তি আসে না। কেড়ে নিয়েছে তার সম্মান, পরিবার, বাবা-মায়ের শাসন-ভালোবাসা, স্বামীর গাইরাত ও সন্তানের আনুগত্যকে। বর্তমানে তাই নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষমতায়িত হলেও সবচেয়ে বেশি নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ হয় এ যুগেই বেশি। নারীরা এখন সবচেয়ে বেশি অসুখী, সুইসাইড রেইটও তাদের মধ্যে সর্বাধিক, এখন তারা সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত ও অনিরাপদ।

আমাদের বোনেদের বোকা বানানো হচ্ছে। একদল পুঁজিবাদী নিজেদের স্বার্থে আমাদের বোনদের বানাচ্ছে ভোগের বস্তু, বাবা-স্বামীর হাত থেকে বের করে এনে নিজেরা শাসন করছে, চিবিয়ে চিবিয়ে শেষ করে দিচ্ছে। আর তাদের কথাতেই আমাদের বোনেরা স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়। নারীদের সিগারেট খাওয়া নর্মালাইজ করা ব্যক্তি এডওয়ার্ড বার্নেইসও দিয়েছিলেন নারী স্বাধীনতার স্লোগান। কিন্তু এ কাজ তিনি কেন করেছিলেন? তাঁর টোব্যাকো কোম্পানির বিক্রি বাড়াতে। রকফেলার পরিবার তো বলেছেই, অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ট্যাক্স করতেই তারা নারী স্বাধীনতার প্রমোটার। পর্নগ্রাফিতে নারী পাচার, নারী নির্যাতন থেকে নিয়ে কী না হয়? অথচ তাতেও নারীরা যাচ্ছে 'স্বাধীন', 'স্বাবলম্বী' হতে। অফিসের পুরুষ বস, কলিগের হাতে কোনো না কোনোভাবে হ্যারেজমেন্টের শিকার হননি এমন কজন আছে? তাও কেন দাঁত কামড়ে পড়ে থাকে তারা?

কারণ নারীবাদ। টাকা ছাড়া, এক পশলা ডিগ্রি ছাড়া সম্মান নেই।

নারীবাদ আমাদেরকে কী দিয়েছে? নারীবাদ দিয়েছে আমাদেরকে ভঙ্গুর সমাজ। মাকে আলাদা করেছে সন্তান থেকে, স্ত্রীকে স্বামী থেকে, কন্যাকে বাবা থেকে। নারী এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অনিরাপদ, নির্যাতিত, ধর্ষিত। বিজ্ঞাপন, পর্ন, মুভি থেকে নিয়ে সবখানেই নারী এখন সবচেয়ে বেশি সেক্সুয়ালি অবজেক্টিফাইড, নারী মানেই কেবল একটি মাংশপিণ্ড। পরিবারগুলো ভেঙে পড়েছে। এত বেশি ডিভোর্স আর কখনোই হয়নি। যৌনতায় ভেসে যাচ্ছে সমাজ। নারীদেহ ব্যবহার করছে বয়ফ্রেন্ড থেকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা—সবাই। নারীকে পেতে এখন দায়িত্ব নিতে হয় না। নারীর দেহ এখন সবার জন্য, বলা হচ্ছে তোমার

নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব তোমারই। বর্তমানের মতো শিশুহত্যাও আগে কোনোদিন হয়নি।

ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা বলেছেন, বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা নাকি সকল সভ্যতার সব সেরা বিষয় নিয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে যত অনাচার ছিল, অসভ্যতা ছিল সবকিছুই রাষ্ট্রীয়ভাবে, অস্ত্র দিয়ে প্রতিষ্ঠা করছে বর্তমান সভ্যতা। যে উপলক্ষ্যগুলোর কারণে আল্লাহ একেকটি সভ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছেন তার সবই তাদের মধ্যে আছে। বর্তমানের মতো এত বেশি ভঙ্গুর, দায়িত্বহীন সমাজ, জনগোষ্ঠী ও প্রজন্ম কখনো আসেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা আগের সকল সভ্যতার সব খারাপ দিক নিয়ে সর্বনিকৃষ্ট সভ্যতা।

বোনদের বুঝতে হবে। যৌবনের শক্তিতে আমরা দুনিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাই। আমরা মনে করি আজকে আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। দুনিয়াকে ইচ্ছামতো উপভোগ করতে পারি। এখন না হলে কখন? রুপে-যৌবনে দুনিয়াকে নাচিয়ে আমরা মনে করি আমরা খুব সফল। চরিত্র, লজ্জা এবং সকল নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করি কেবল কিছু মজার জন্য। কিন্তু ৩০-৩৫ পেরোলেই এক নতুন বাস্তবতা দেখতে পাই সবাই। কী করেছি? কেন করেছি? আজ কে আছে আমাদের পাশে? কার হাত ধরে কবরে যাব? আমি ভালো আছি তো? টাকার বিনিময়ে যে সম্মান ধরে রাখতে চেয়েছি আজ তারা আমাকে সম্মান করছে তো? আমার স্বামী-সন্তান কি আমার আছে?

নারীবাদের ব্যাপারে একদম মৌলিক কিছু ফ্যাক্ট ও প্রশ্ন তুলে এনেছেন মারিয়াম তানহা তাঁর এই সংকলনে। পশ্চিমা নারী স্বাধীনতার বাস্তবতা থেকে নিয়ে নারীবাদের ইসলামবিদ্বেষ, ধ্বংসাত্মক ফলাফল, নারীবাদের বৈষম্য, নারীদের অবজেক্টিফিকেশন, মুসলিম নারীবাদের জগাখিচুড়ি, নারী অধিকারের নামে চালানো যুদ্ধ ও উপনিবেশবাদ-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে গভীর ও টু দ্য পয়েন্ট আলোচনা এসেছে। সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হলো, নারীদের ব্যাপারে মুসলিমদের অবস্থান ও নারীদের আসল সম্মান নিয়ে বইয়ের শেষে সুন্দর উপসংহার এসেছে। আমার ধারণা বাংলা ভাষায় এভাবে গোছানো কাজ আগে তেমন হয়নি। বইটি পড়তে গিয়ে আমি অনেক বেশি অবাক হয়েছি, নিজের অনেক ভুল ধারণা ভেঙেছে।

হুমায়ূন আহমেদ তার এক বইয়ে একটি সুন্দর গল্প বলেছেন। এক রিক্সাচালক নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে যাচ্ছে-তাই বলছিল। উপসংহার টানল এই বলে, আরে কইয়েন না, মাইয়া মানুষ মানেই ঝামেলা। মাইয়া মানুষের লাইগাই আদম দুইন্যাতে নাইমা আইসে। (কথাটা সত্য নয়। ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই।)

হুমায়ূন আহমেদ তখন জবাব দিলেন, 'নারীর কারণে যদি আমরা জান্নাত থেকে বিতাড়িত হই তবে নারীই পারবে আমাদেরকে জান্নাতে ফিরিয়ে নিতে'।

বইটি বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছানো প্রয়োজন। টাকা থাকলে নিজে দাইয়ুস হওয়া থেকে বাঁচতে, পৃথিবীর অনির্মল অশ্লীলতা ও পরকালে সুন্দর মুখগুলোকে পোড়াতে না চাইলে নিজের মা, বোন, মেয়ে, মাহরামদেরকে বইটা পড়তে দিন, পড়তে বলুন। বই পড়ার অভ্যাস না থাকলে সাপ্তাহিক আলোচনা করুন বইয়ের টপিক নিয়ে। বোনদের যদি বে-দ্বীনদার বান্ধবী থাকে তাদের উপহার দিন। সোনালি দিন ফিরে পেতে হলে নারীদেরকে স্বর্ণের হতে হবে।

নারীকে বাঁচান। কেননা নারী বাঁচলেই বাঁচবে পৃথিবী।

ইরফান সাদিক
irfansadik35@protonmail.com
১ মার্চ, ২০২২

অনুবাদকের কথা

আজ থেকে অনির্দিষ্টকাল পরে যখন ইসলামি খিলাফাহর শিশুরা আমাদের সময়ের ইতিহাস পড়বে, তখন তারা কীভাবে দেখবে আমাদের নারীদের? তারা দেখবে একটি অসুস্থ সমাজ, একটি অসুস্থ বিশ্ব। তারা পড়বে ২-৩ বছর বয়সী অসুস্থ বাচ্চাদের কথা, যারা মায়ের আদর পায় না, মায়ের উষ্ণতা পায় না। কাজের বুয়ার আদরে, 'মোটু পাটলু'র সাথে বড় হওয়া শিশুদের ভবিষ্যৎ দেখে চমকে উঠবে ওরা। অবাক হয়ে ভাববে, 'এ বাচ্চারা মায়ের কোলে শুয়ে মুসআব বা আসহাবে সুফফার গল্প শোনে না? কীভাবে সম্ভব? রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে সাহায্য করতে করতে আড্ডা দেয় না?' সন্তান এবং মায়ের হাজার বছরের যে সম্পর্ক, তা এ সভ্যতায় এসে কীভাবে ধ্বসে পড়ল, তা দেখে অবাক হবে তারা। বারবার সিজদায় পড়ে যাবে এই সভ্যতায় তাদের না জন্মের জন্য। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে মাকে অনেক আপন করে পাওয়ার জন্য। মায়ের স্নেহ তাদের কাছে ফর গ্রান্টেড হবে না।

তারা পড়বে অসহায় কিছু নারীর গল্প। পরিবার, চাকরি সব চালিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে বিবর্ণ কিছু চেহারা দেখবে। দেখবে রাজাবাদশাদের আমলের বাইজিদের মতো জীবন বেছে নেওয়ার জন্য কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়া, রাস্তার বিলবোর্ড—সবকিছু তাদেরকে চাপ দিয়েছে। তাদের ভালোবাসা, মর্যাদা, মাতৃত্ব সবকিছু কীভাবে ভুলে গিয়েছে পৃথিবী এবং বাধ্য করেছে শরীর বেঁচে টাকা জোগাড় করতে। টাকা বাদে কোথাও সম্মান রাখা হয়নি তাঁর—না পরিবারে না সমাজে। তারা তাদের মা-বোনদের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাবে, মাকে জড়িয়ে ধরবে, কেঁদে কেঁদে মাকে ধন্যবাদ দেবে, তাদের মায়েরা তাদেরকে এ সভ্যতার মাদের মতো টাকার জন্য, শরীর বেঁচার জন্য ছেড়ে দেয়নি যে!

তারপর তারা পড়বে একদল পুরুষের গল্প। সেসব পুরুষ—যাদের কাছে স্বার্থ বাদে আর কোনোকিছুর কোনো মূল্য নেই। তারা স্বার্থের জন্য সব করতে পারে। স্বার্থের জন্য পরিবারকেও ব্যবহার করতে পারে। শিশু থেকে শুরু করে সবকিছুকেই তারা ব্যবহার করেছে তাদের ব্যবসার জন্য। এ পুরুষরাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের কাজে নারীদেরকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছে, দুর্বল দেখে টাকা না দিয়ে কাজ

করিয়ে নিয়েছে অনেক বেশি। তাদের অধিকার রক্ষায় পুরুষও ছিল না কোনো। একদিন নারীরা যখন ঘুরে দাঁড়াল, নিজেদের অধিকার নিয়েই সোচ্চার হলো, সে পুরুষরা টেবিল ঘুরিয়ে দিলো। নারীদের শরীরকে ব্যবহার করতে শুরু করল, শরীর বেচে নিজেদের ব্যবসা বড় করল। নারীদের কেড়ে নিলো তাদের পরিবার থেকে, বাচ্চাদের থেকে। নারীকে বলা হলো, টাকাই তোমার সম্মান, সন্তান-পরিবারের জন্য জন্ম হয়নি তোমার। এমনকি নারীর 'নারী' পরিচয় পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে তারা। ঘোষণা করেছে, যে কেউ নিজেকে 'নারী' দাবি করতে পারবে।

সনাতন ধর্মের সতীদাহ প্রথা দেখে আমাদের যেমন অবাক লাগে, নাক সিঁটকে উঠি আমরা, ঠিক সেভাবেই মনের ভেতর থেকে এ সভ্যতার সবকিছুকে ঘৃণা করবে খিলাফাহর যুগের শিশুরা। তাকে ইতিহাসের বই পড়াবার সময় মাকে সে প্রশ্ন করবে না, কেন এ সভ্যতার গুরুরা এমন ছিল। কারণ সে জানে, আবু জাহল, ফেরআউন-সহ যুগে যুগেই জালিম-কাফিররা এমন। তারা সবসময় স্বার্থবাদী। আল্লাহকে নিয়ে তারা ভাবে না, নিজেদের খোদা মনে করে তারা। জাহিলিয়াহ অনেক বেশি বর্বর হবে, বিকৃত হবে এটিই স্বাভাবিক। জাহিলিয়াহর হাতে পৃথিবীর সবাই কষ্ট পাবে, এটিই বাস্তব। বরং অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করবে, 'মা! সে সভ্যতায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতো কেউ ছিল না, যে তাতারদের মতো লিবারেলদেরকে তাড়িয়ে দেবে? ছিল না আইয়ুবির মতো কেউ? ইমাম আহমদের মতো কেউ ছিল না যে মুতাজিলাদের মত খণ্ডন করে অসাড় করে দেবে নারীবাদীদের যত কুযুক্তি? আচ্ছা সে সভ্যতায় কি কোনো মুসলিমই ছিল না?'

সত্যিই তো? মুসলিম কি নেই?

এটিই সবচেয়ে হতাশার জায়গা। ৯০% মুসলিমের এ দেশেই নয়, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে, সমগ্র আরব বিশ্ব, মুসলিমবিশ্বজুড়ে মুসলিম নামের নারীরা সরে গিয়েছে ইসলাম থেকে অনেক দূরে। স্কুল-কলেজের বারান্দা দিয়ে খিলখিল করে দৌড়াতে থাকা বালিকাদের জিজ্ঞেস করুন, নারীবাদীদের মতো উত্তরই পাবেন। ফিকহের পাতা উলটে, শরিয়তের কাছে এসে জিজ্ঞেস করার মতো সময় কারও নেই, আল্লাহ কী বলছেন, রাসুল ﷺ কী বলছেন। তারা জানে কী বলছেন। কারণ তাদেরকে 'আসল ইসলাম' শিখিয়েছে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা, সেক্যুলার মিডিয়া। সে ইসলামে সব আছে, শুধু আল্লাহ যা বলেছেন তা বাদে। সে ইসলামে সব করা যায়, কেবল সাহাবিরা যা করেছেন তা বাদে। এ ইসলামের সাথে কোনোকিছুর কোনো সংঘর্ষ নেই। নারীবাদের একটি ইসলামি ভার্সনও দাঁড় করানো হয়েছে—মুসলিম নারীবাদ। এ বিষয়টি নিয়েও বইয়ে একাধিক অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

জাহিলিয়াহ নারীকে কখনোই শান্তি দিতে পারেনি। স্বামী মারা গেলে স্বামীর দেহের

সাথে স্ত্রীকে পুড়িয়ে ফেলা, কন্যাসন্তানকে দুর্বলতা মনে করে সামাজিক চাপে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা, স্ত্রীর গলায় কুকুরের মতো শেকল পরিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া, ফোরাত নদে পানি আনার জন্য নারীবলি দেওয়া-সহ অসংখ্য জুলুম নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে জাহিলিয়াহ। সকল জাহিলিয়াহ-ই মানুষের সৃষ্ট এবং মানুষ যুগে যুগে তাদের উগ্র যৌন উন্মাদনা এবং শক্তির বড়াই চাপিয়ে দিতে চেয়েছে নারীর ওপর। ঠিক এ কারণেই জাহিলিয়াহ উন্মুক্ত যৌনতায় ভরতি—হোক তা সনাতন ধর্মের বেদ কিংবা সিগমুন্ড ফ্রয়েড, আলফ্রেড কিনসির চিন্তাভাবনা। সমাজকে নিজের স্বার্থমতো চালানো একদল পুরুষের কাজ এসব। তাদের চাপে শ্রদ্ধেয় বাবা, স্নেহের ভাই—সবাই চোখের জল ফেলে বাধ্য হয় নিজের পরিবারের ওপর এসব করতে। আজকের জুলুম আরও ভয়াবহ। আগে নারীরা জুলুমকে জুলুম বলে বুঝত, এখন প্রোপাগান্ডার তোড়ে জুলুমকেই মনে করে সম্মান। কোনো জাহিলিয়াহতে মুক্তি নেই নারীর।

সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেক্যুলার দেশে থাকা একজন নারী হিসেবে আমার কাছে নারীবাদ ও নারী অধিকারই ছিল বাস্তব, 'কমনসেন্স'। আমি যে একটি ফিতরাহ নিয়ে জন্মেছিলাম, নারী হিসেবে আমার যে মাতৃত্ব, লজ্জাশীলতা, তেজের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য এককালে ছিল, তা পুরো পৃথিবী মিলে ভুলিয়ে দিচ্ছিল আমাকে। বুঁদ হয়েছিলাম 'সফল' হওয়ার আশায়। জীবনে আর কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু যখন আল্লাহর কাছে এলাম, শারিআহর কাছে এলাম, মনে হলো যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। মনের কোণে যে অসন্তুষ্টিকে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, বুঝ দিচ্ছিলাম, তা চলে গেল এক নিমিষে। আল্লাহপ্রদত্ত নারীত্ব, লজ্জাশীলতা—সব যেন ফিরে এলো।

সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু একটি হতাশা কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছিল। অন্য বোনদেরকে নিয়ে হতাশা। এ মেয়েরা আমার সাথেই পড়েছে, আমার মতোই এক অলীক স্বপ্নের পেছনে দৌড়াচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না তাদের জীবনের অবস্থা। তাদের যা শেখানো হয়েছে তাই বুঁদ করে রেখেছে তাদেরকে। বলা হচ্ছে এর চেয়ে ভালো জীবন হয় না। জীবন বদলাতে চায় না তারা, ভাবতে চায় না বাক্সের বাইরে। ঠিক এ সময়টিতেই আমার শাইখ আবু নাওয়ার, ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজু, উম্মে খালিদ, জারা ফারিসদের জগতে প্রবেশ। অসাধারণ একটি অনুভূতি হলো, 'আরে! এসবই তো খুঁজছি আমি'। যতই পড়লাম, লজ্জিত হলাম। কত জাহিলিয়াহতে ডুবে আছি, কিন্তু বুঝতেই পারছি না সেগুলো জাহিলিয়াহ। জাহিলিয়াহর একেকটি বন্ধন ছিন্ন করতে এক অন্যরকম প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছিল। অনুশোচনা, ভালো লাগা, লজ্জা, তৃপ্তি—সবমিলে এক মিশেল অনুভূতি। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমার বোনদেরকে ধরে ধরে পড়াই, বুঝাই। সেখান থেকেই মাতৃভাষায় কাজগুলো নিয়ে আসার চিন্তা।

সত্য বলতে, আন্তর্জাতিকভাবে নারীবাদের ফিতনা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। সবগুলো এক মলাটে আনা সম্ভব না। পরবর্তীকালে আল্লাহ আরও কাজ আনার সুযোগ দিন। প্রথম অনুবাদ হিসেবে অনেক ভুল থাকা স্বাভাবিক। আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং মৌলিক ভুলগুলো আমাকে মেইল করতে পারেন। এ বইটির পেছনে সম্পাদক, প্রকাশক-সহ যারাই কষ্ট করেছেন, যাদের ক্রমাগত কষ্টের কারণে এ বইটি মলাটবদ্ধ হয়েছে, আলোর মুখ দেখেছে—তাদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। এ বইয়ের সব ভালো কিছু কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে, ভুলের জন্য কেবল আমি ও শয়তানই দায়ী। আল্লাহ সকল ভালো বিষয়গুলো আমাকে ও পাঠক বোনদের আমল করার তৌফিক দিন এবং সকল ভুলগুলো সকলের অন্তর থেকে মুছে দিন। আমিন।

মারিয়াম তানহা
tanhamarium37@gmail.com
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

স্বাধীনতা নাকি নৈতিক অধঃপতন : পাশ্চাত্যের দ্বিচারিতা

[১]

পশ্চিমের নৈতিক অধঃপতনের যেন কোনো সীমা নেই। পশ্চিমা নারীরা এখন রীতিমতো উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে উলঙ্গ হওয়ার অধিকারের জন্য আন্দোলন করছে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, উলঙ্গ হওয়ার অধিকার।

> 'ফ্রান্সে একজন মহিলাকে টপলেস রৌদ্রস্নান (Sunbath) করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর প্রতিবাদেই কিছু নারী—কোনো স্তনবৃন্তই স্বাধীন নয় যতদিন না সব স্তনবৃন্ত স্বাধীন হয়—স্লোগানে আন্দোলনে নামেন। সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, পার্কের কর্মকর্তা বার্লিনের সে নারীকে জামা পরে পার্ক থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। তিনি টপলেস অবস্থাতেই বাচ্চাদের প্যাডলিং পুলের পাশে রৌদ্রস্নান করছিলেন।'
>
> —South China Morning Post[১]

এসব পেডোফিলিক পশ্চিমাদের কাছে বাচ্চাদের সামনে উলঙ্গ হওয়া কোনো সমস্যাই না। কেন নয়? তাদের দাবি, দেহ নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তাই যতবেশি পারো বাচ্চাদের সামনে উলঙ্গ হও। বাচ্চাদের জন্য প্রচারিত একটি ডাচ টিভি শোতে[২] অনেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে উলঙ্গ দেখানোর কারণও এটাই। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, এ উলঙ্গ লোকদের অনেকেই সময়ে সময়ে বাচ্চাদেরকে যৌন হয়রানির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। অবাক করা বিষয়!

প্রকাশ্যে উলঙ্গ হয়ে আন্দোলন করা এসব উন্মাদদের সাথে আলোচনা করা কীভাবে সম্ভব? প্রকাশ্যে বাচ্চাদের সামনে উলঙ্গ হয়ে নিজেদের গোপনাঙ্গ প্রকাশ করে তৃপ্ত হওয়া, স্বাধীন অনুভব করা, বাচ্চাদেরকে যৌন হয়রানি করা এসব মানসিক বিকৃত

---

[১] Women demonstrate topless in Berlin for right to bare breasts in , *South China Morning Post*, https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3140643/women-demonstrate-topless-berlin-right-bare-breasts-public

[২] Dutch TV show for kids features naked adults, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/holland-tv-show-naked-adults-children-b1814563.html

মানুষকে কীভাবেই-বা শালীনতা, নৈতিকতার বুঝ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব?

এদেরকে এভাবে আন্দোলন করার অনুমতিই-বা কেন দেওয়া হয়? কেন পুলিশ এসব উন্মাদদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করছে না? কেন তারা সামাজিক শালীনতার পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে না? সত্য বলতে পশ্চিমা সরকারগুলো চায় এসব হোক। তারা এসব নৈতিক অধঃপতনকে অনুমোদন করে। সামাজিক অশালীনতাই তাদের হাতিয়ার। সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তিপূজাই তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার।

জাতীয়ভাবে 'সবার স্তনই সমান' স্লোগানে একটি আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এ আন্দোলনের নারীকর্মীরা পুরুষদের মতোই জামা ছাড়া প্রকাশ্যে টপলেস চলাফেরা করার অধিকার চায়। তাদের অনলাইন পোর্টালের দাবি অনুসারে, স্তনকে যৌনতার রূপ না দিয়ে স্বাভাবিক করা হোক।

অধঃপতনের মাত্রা বুঝে ওঠা আসলেই কষ্টকর। তারা যা ইচ্ছা তাই করছে। তাদের প্রবৃত্তির চূড়ান্ত প্রদর্শনী করছে। এসব নারীবাদীরা বাচ্চা-সহ সবার সামনেই নিজেদেরকে উলঙ্গ করার অধিকার চায়, অথচ তারা কথা বলে ছেলেদের উলঙ্গ হওয়ার বিরুদ্ধে। তাদের মতে, এ MeToo আন্দোলনের যুগে পুরুষরা তাদের শরীরের কোনো কিছু প্রকাশ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সামনে থাকা নারীদের অনুমতি ছাড়া এ কাজ করা নাকি এক প্রকার হয়রানি। এ কোন ধরনের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড?

এসব নারীরা নিজেদেরকে উলঙ্গ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কিন্তু যখন তাদের অপছন্দের কারও দৃষ্টি তাদের ওপর পরে যায়, একে তারা যৌন হয়রানি বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে। চলুন তাদের আরও কিছু ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দেখি। একই অবস্থা, একই প্রেক্ষাপট, শুধু মানুষ ভিন্ন।

২০১৬ সালে ফ্রান্সে 'বুরকিনি' নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। হিজাব পরিহিত মুসলিম নারীদের সাঁতারের জন্য শালীন একধরনের পোশাকের নাম বুরকিনি। এ বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রবল বিভক্তি দেখা দেয়। বিরাট অংশ মনে করে, বুরকিনি নিষিদ্ধ করা উচিত। সমুদ্র তীরবর্তী অনেক রিসোর্টে বুরকিনি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। এদিকে ২০১৬ সালের ২৩ অক্টোবর, দুজন ফ্রেঞ্চ পুলিশ অফিসার সমুদ্রতীরে একজন নিকাবি নারীকে সবার সামনে নিকাব খুলে ফেলার আদেশ দেয়। ইউরোপীয় কোনো নারীনেত্রী সেদিন বুরকিনির পক্ষে দাঁড়ায়নি, নারী স্বাধীনতার কোনো লম্বা বুলি আওড়ায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো আন্দোলনই দানা বেঁধে ওঠেনি। নারী স্বাধীনতা সেদিন মিথ্যা হয়ে

গিয়েছিল।

দিনশেষে তাদের লড়াই শালীনতার বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে। তারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে না, তারা তাদের নৈতিক অধঃপতনের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। যেন সকল প্রকার অশালীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

[২]

এনলাইটেনমেন্ট বোদ্ধারা মনে করেছিলেন, রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করতে পারলেই বুঝি ধর্মগুলোর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আজকের বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। ২০১৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত একটি রুলিং দিয়ে কোম্পানিগুলোকে ধর্মীয় চিহ্ন নিষিদ্ধ করার অনুমতি দেয়। এখানে ইয়ারমুলক, ক্রস নিষিদ্ধ করা হয় এবং অবশ্যই হিজাবও। তাদের আগের অবস্থানকে বৈধ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন আবার কেসটি খুলেছে।

'ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যক্তিগত কর্মজীবিরা তাদের প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্মীয় চিহ্ন নিষিদ্ধ করার অধিকার রাখে। এগুলোর মধ্যে মাথার স্কার্ফও আছে। ব্লকের সর্বোচ্চ আদালত নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে এমন রায় দেয়।'—The Guardian.[৩]

২০১৭ সালের সিদ্ধান্তকে আবারও সঠিক ঘোষণা করে বলা হয়েছে, কোম্পানিগুলো তাদের পলিসির অংশ হিসেবে সকল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিহ্ন নিষিদ্ধের অংশ হিসেবে মাথার স্কার্ফও নিষিদ্ধ করতে পারবে। সর্বশেষ রায়ে কোন চিন্তা থেকে এ কাজ করতে পারবে কোম্পানি মালিকরা, তাও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এভাবে নাকি ক্রেতা ও ব্যবহারকারীর যোগাযোগ সহজ হয়। তারা সকল প্রকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় ছুড়ে ফেলে তাদের মতো করেই তাদের আপন হতে হবে, তাদের চাহিদা বুঝতে হবে।

ইইউর মতে, এ কাজ করেছে তারা সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠায়, নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে। তারা কোম্পানিদেরকে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার ফ্রি লাইসেন্স দিয়ে দিলো। তারা প্রমাণ করে দিলো, ঘরের দেয়াল বা উপাসনালয়ের বাইরে ধর্ম, এমনকি ধর্মীয় পোশাকে আসাও কাম্য নয়। এটাই সেক্যুলার আগ্রাসন। এভাবে ধার্মিক মানুষদেরকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হবে, না-মানুষ করা হবে।

দুজন জার্মান মুসলিম নারী এ মামলা দায়ের করেন। তাদের একজন ছিলেন চাইল্ডকেয়ার কর্মী, আরেকজন ছিলেন একজন কেমিস্টের সেলস অ্যাসিস্টেন্ট।

---

[৩] EU companies can ban employees wearing headscarves, court rules, https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/eu-companies-can-ban-employees-wearing-headscarves-religious-symbols

মাতৃত্বকালীন ছুটির পর কাজে ফিরে তারা দুজন হিজাব পরার সিদ্ধান্ত নিলে তাদেরকে বাধা দেওয়া হলো। তাদেরকে হিজাব খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে যেকোনো ধর্মীয় চিহ্নই নিষিদ্ধ, হোক তা খ্রিষ্টানদের ক্রুশ কিংবা ইহুদিদের কিপ্পাহ। এ নারীকে দুইবার সাসপেন্ড করা হয় এবং লিখিতভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়। সে নারী জার্মান কোর্টে এ আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন।

খুবই জঘন্য কৌশল। তারা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছে যাতে নারীরা বাইরে কাজ করতে উৎসাহিত হয়। তারাই এক শতক ধরে নারীবাদী প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে গৃহিনী নারীদেরকে নিন্দিত, লজ্জিত করেছে। তাদেরকে তুলনা করেছে দাসের সাথে, নীচুশ্রেণির মানুষদের সাথে। এতকিছু করার পরে তারা এবার মুসলিম নারীদের শেষ ধর্মীয় পরিচয়ও কেড়ে নিতে চায়। হয় হিজাব নয় চাকরি। এ ধরনের আইনের পরিণতি দুই ধরনের—মুসলিম নারীদের ওপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ করে সেক্যুলার সমাজে তাকে খুব বেশি সমাজবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে, এক ঘরে করে দেওয়া হবে। আরেকটি হলো, মুসলিম নারীরা দ্বীন রক্ষার জন্য আরও বেশি বেশি গৃহিণী হওয়ার দিকে ঝুঁকবেন।

প্রেসিডেন্ট এরদোগানের মুখপাত্র ইবরাহিম কালিন[৪] উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেন,

> ‘কর্মক্ষেত্রে হিজাব পরিধানের বিরোধিতা করে ইউরোপীয় কোর্ট অফ জাস্টিসের এ সিদ্ধান্ত মুসলিম নারীদের অধিকারের ওপর আরেকটি বড় আঘাত। এভাবে ইউরোপের মুসলিমবিদ্বেষী ক্রুসেডার, সাদা আধিপত্যবাদীরা উৎসাহিত হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে আসলে কী বোঝায়? এ স্বাধীনতা থেকে মুসলিমদেরকে ঘোষণা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো?’

ইবরাহিম কালিন ইউরোপের ভণ্ডামি নিয়ে ঠিকই বলেছেন। ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়ন—এগুলো কেবল কিছু অর্থহীন স্লোগান। যখনই এগুলো তাদের কোনো কাজের প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়, তারা এগুলোকে ছুড়ে ফেলে।[৫]

---

[৪] Turkey says EU headscarf ruling ‘grants legitimacy to racism’, https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/turkey-says-eu-headscarf-ruling-grants-legitimacy-to-racism

[৫] Muslim Skeptic এ প্রকাশিত হুদ লেস্প্রিতের *Feminist Protest: Let Us Get Naked in Front of Your Children!* আর্টিকেলের অনুবাদ।

দি আফ্রিকোম ফাইলস
মার্কিন সেনাবাহিনীর নারী চিকিৎসা[৬]

২০১৭ সালের ৫ই জুন আফ্রিকার এক ক্যাম্পের আলফা কোম্পানিতে আমেরিকার এক নারীসেনা তাঁর প্রথম শিফট শুরু করেন। এ ক্যাম্পটি আগে থেকেই যৌন হয়রানির জন্য কুখ্যাত। তাই তিনি চাননি এখানে কাজ করতে, কিন্তু তাঁর কিছু করারও ছিল না। নারী স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়নের সামাজিক বাস্তবতার বলি হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে এখানেই কাজ করে যেতে হবে।

রাত তখন ১২টা। কখন যে রুমে তিনি একজন সিনিয়র নন কমিশন অফিসারের সাথে একা হয়ে পড়েছেন, কাজের চাপে খেয়ালই করেননি সেই নারীসেনা। সেই অফিসার নারীসেনাকে যৌন সঙ্গমের আহ্বান জানান। তিনি নাকি ৯ মাস ধরেই এমন ইচ্ছা পোষণ করছেন। নারীসেনা বাধা দিলেন না। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন তাঁকে আবার শারিরীকভাবে আক্রমণ করা হয় কিনা। পরবর্তী সময়ে একদিন সেই অফিসার জোর করে তাঁর ওপর প্রচণ্ড সহিংস যৌন নির্যাতন করতে চায়। শারিরীক নির্যাতনের ভয়ে সেই নারীসেনা জনৈক অফিসারের সাথে কো-অপারেট করেন।

এই হলো নারীর বিরাট শুভাকাঙ্ক্ষী, নারীবাদের জন্মদাতা, আফগানিস্তানের তথাকথিত 'বন্দি' 'অবহেলিত' নারীদের রক্ষায় উঠেপড়ে লাগা আমেরিকার সেনাবাহিনীর অবস্থা। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এমনকি একমাত্র ঘটনাও নয়। এমন ঘটনার অভিযোগ এসেছে ১৫৮টি। তার মধ্যে আছে যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণের মতো অভিযোগ। আসল ঘটনার সংখ্যা যে আরও বেশি তা বলাই বাহুল্য।

Intercept এবং Type Investigations আমেরিকার সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীর এমন কিছু তথ্য বের করে এনেছে। ১৫৮টি অভিযোগ তো কেবল আফ্রিকাতে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন প্রায় অর্ধেকের মতো অভিযোগ অস্বীকারই করেছে। এই ১৫৮টি অভিযোগ-সংবলিত ফাইলের নাম—

---

[৬] স্ক্রিপ্টটি গ্রহণ করা হয়েছে অনলাইন দাওয়াহ প্লাটফর্ম 'ফ্রন্টিয়ার' থেকে। ভিডিওর লিংক : https://youtu.be/hJDIDEIrK6o
মূল রিপোর্ট- The Africom Files, https://www.typeinvestigations.org/investigation/2021/07/06/the-africom-files/

দি আফ্রিকোম ফাইল।

শুধু আফ্রিকাতেই না, আমেরিকার মানবতাবাদী সেনাবাহিনীর এ সমস্যা দেশজুড়ে, সারা বিশ্বজুড়ে। কোনো নারীসেনাকে বাইরের কোনো দেশে পাঠানো হলে তা যেন সাক্ষাৎ নরক হয়ে আসে ওই নারীসেনার জন্য। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আফগানিস্তান বা ইরাকের নারীসেনারা তাদের সাথে হওয়া যৌন হয়রানি এবং যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করতে পাহাড়সম বাধার সম্মুখীন হন। পেন্টাগনের সমীক্ষায় বলা হয়, প্রতিবছর প্রায় ২০,৫০০ জন পরিষেবা সদস্য যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। SAPRO-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে মাত্র ৬,২৯০টি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করা হয়েছে। এ বছর Government Accountability Office-এর অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, যেসকল সাধারণ কর্মীদের ওপর যৌন নির্যাতন হয়েছে তাদের প্রায় ৯৭ শতাংশ অভিযোগ পেন্টাগন গ্রহণই করেনি।

লজ্জা, গোপনীয়তা, ভয়ের মতো অনেক কারণে অনেকেই অভিযোগ দায়ের করেন না। যারা অভিযোগ করেন তাদেরকে অনেক হয়রানির শিকার হতে হয়। নামকাওয়াস্তে যা বিচার হয়, তাতে কারও কোনো শাস্তি হয় না। মাত্র ০.৯ শতাংশ ঘটনার মামলা দায়ের হয়, বিচার হয় খুবই কম। ওকলাহোমা বেইজে যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের অতি সাধারণ একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। নারী সৈনিকদের এখানে সহজেই যৌন উপায়ে ব্যবহার করা যায়। তারা অভিযোগ করতেও অনেক ভয় পায়। কেননা তাদেরকে একঘরে করা হয় কিংবা আরও বেশি করে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

এই হলো বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের প্রচার করা, মুসলিম বন্দি নারীদের বিশ্বজুড়ে মুক্ত করার মিশন চালানো আমেরিকার সেনাবাহিনীতে নারীদের অবস্থা। এই হলো নারী স্বাধীনতার বাস্তবতা। এগুলো হাজার বছর, শতবর্ষ আগের কথা না, সাম্প্রতিক ঘটনা। এরাই যখন আফিয়া সিদ্দিকিকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে, ১৪ বছর বয়সী আবির আল-জানাবিকে ধর্ষণ করে পরিবার-সহ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়—সেগুলো কি খুব বেশি অবাক করা বিষয়? বিশ্বজুড়ে নারী অধিকারের পক্ষে লড়াই করে যাওয়া এ দেশগুলোই নারীকে যৌনতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করেছে দিনের পর দিন। নারী কেবল সাম্রাজ্যবাদ জায়িজ করার একটি কার্ডমাত্র।

কী গ্রহণ করবেন? নারী অধিকারের কথা বলে সেই নারীদেরকেই জাতিগতভাবে ধ্বংস করা পশ্চিমাদের? নাকি শাশ্বত সেই বিধানকে, যা দেড় হাজার বছর ধরে নারীকে দিয়ে যাচ্ছে তার যথার্থ সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার?